শ্রীমর 'কথা'

বিশ্বজিৎ রায়

রামকৃষ্ণদেবের কথার সংকলকদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অর্থাৎ শ্রীমই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের কথাকে ইংরেজি পুস্তিকায় প্রথম প্রকাশ করার পর তিনি যখন পরবর্তী কালে সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে বাংলায় রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত প্রকাশ করেন তখন বাঙালি ভদ্রসাধারণ তা পরম আদরে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমর রচনা সম্বন্ধে অনেকেই অভিযোগ করেন যে তিনি ঠাকুরের কথার সঙ্গে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়েছেন। গোপালচন্দ্র রায় অভিযোগ করেছিলেন, নিজের ডায়েরির সূত্রগুলি থেকে শ্রীম বিস্তৃত করেছিলেন কথামৃতের পাঠ্য। এ অবশ্য কিছু নতুন কথা নয়, তবে অভিযোগের সুর সেখানে ছিল না।

বিবেকানন্দ-সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'মাষ্টার মহাশয়ের অনুধ্যান' বইতে লিখেছেন, ''মাষ্টার মশায় যখন কথামৃত লেখেন, রাত্রিতে আমি কয়েকবার তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম।" কী দেখলেন তিনি? ''গরমকাল, ছাদের উপর বসিয়া, কখন বা শুইয়া তিনি তাঁহার করচা (Diary) হইতে লিখিত পঙ্‌ক্তি পড়িয়া ঘটনাসকল স্মরণ করিয়া বলিয়া যাইতেন এবং অপর একজন লিখিয়া যাইত।" (নিম্নরেখা সংযোজিত) অর্থাৎ ডায়েরিতে সব কথা লেখা নেই—শ্রীম ডায়েরি সম্প্রসারিত করছেন। সমকালীন মহেন্দ্রনাথের মনে না হলেও পরবর্তী কালের আলোচকদের মনে হয়েছে এই বিস্তার যেন খোদার উপর খোদকারি। শ্রীমর 'সততা' সম্বন্ধে গোপালচন্দ্র রায় প্রশ্ন তুলেছেন, অনেকেই পরে তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁদের অভিমত, শ্রীরামকৃষ্ণ যা ছিলেন আর শ্রীম তাঁকে যেভাবে কথামৃতে প্রকাশ করলেন তা ভিন্ন। কথামৃতের ঠাকুর শ্রীমর 'নির্মাণ'। তাঁদের মতে সেই নির্মাণের পিছনে শ্রীমর বিশেষ উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল। যেন ঠাকুর তেমন মহিমময় নন, শ্রীম তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন।

বিষয়টির বিচার অন্যভাবে করা উচিত বলেই মনে করি। ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠীর অভিমত, ''অবশ্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম শ্রেণির উপাদান। রামকৃষ্ণের শেষ জীবনের সাড়ে চার বছরের এমন প্রামাণ্য দলিল অন্যান্য মিস্টিক সাধু-সন্তের ভাগ্যে জোটেনি। সাধারণত যেদিন শোনা হত সেদিনই দিনে বা রাতে লিপিবদ্ধ করা হত। শিবানন্দ মহারাজ বলছেন, ঠাকুর কোনও গভীর আধ্যাত্মিক কথা বলার আগে 'মাস্টার'কে

ডেকে পাঠাতেন। বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অভেদানন্দ—সবাই এঁকে নির্ভরযোগ্য স্বীকার করেছেন।"[১]

অমলেশ ত্রিপাঠী শ্রীমর রচনাকে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির উপাদানের মর্যাদা দিয়েছেন। সন্দেহ নেই শ্রীম রামকৃষ্ণের কথার প্রত্যক্ষশ্রোতা ও লিপিকার। লিপিকার হিসেবে কেন তিনি গ্রহণযোগ্য তার পক্ষেও ত্রিপাঠী যুক্তি সাজিয়েছেন। তাঁর অভিমত, ঠাকুরের অপরাপর শিষ্যরা শ্রীমর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। শ্রীমর শ্রবণ ও লিখনের মধ্যে সময়ের দূরত্ব সামান্যই, কাজেই 'বিস্মৃতি'র সম্ভাবনা কম। তাঁর এই যুক্তিগুলি মেনে নিয়েই বলা যায় শ্রীমর কথা ঠাকুরের কথার আধার, পাত্রে ধারণ করতে গেলে সারবস্তুতে পাত্রের স্পর্শপ্রভাব পড়বেই। যাঁরা শ্রীমর কথামৃত পড়ছেন তাঁরা শ্রীমর আধারে ঠাকুরকে দর্শন-শ্রবণ করছেন। এ অনিবার্য। কিথ জেনকিন্‌স তাঁর 'Rethinking History' বইতে অতীত আর ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। অতীত আর ইতিহাস এক নয়। ইতিহাস অতীত বর্ণনার প্রচেষ্টা, কোনও ব্যক্তির বয়ান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতও শ্রীমর বয়ান। কেমন তার চরিত্র?

আমাদের মতে শ্রীমর কথামৃত ঠাকুরকে একভাবে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছে। ঠাকুরের কথা-গীত-নৃত্য আধ্যাত্মিক অভিকরণ (spiritual performance) বিশেষ, শ্রীম শব্দচিত্রে তা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কথামৃত আধ্যাত্মিক অভিকরণের গ্রন্থরূপ, সেই গ্রন্থরূপের পূর্বপাঠ শ্রীমর ডায়েরি। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'রামকৃষ্ণের ধর্ম' বিষয়টির আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম বলতে আমরা... আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথাই বলি।"[২] আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ ঈশ্বরকে পাওয়ার উদ্যোগ বা ইচ্ছে, আর সব গৌণ। এই ইচ্ছেই ঠাকুরের নিত্যদিনের যাপনে প্রকাশিত। শ্রীম সেই যাপিত-অভিকরণ দেখেছেন, ডায়েরিতে লিখেছেন—যতটা সম্ভব।

শ্রীমর ডায়েরি আর কথামৃতের গ্রন্থরূপ আলাদা। ডায়েরির তথ্যকে তিনি কথামৃতে সম্প্রসারিত করেছেন। আসলে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অভিকরণকে শ্রীম কীভাবে বুঝেছেন ও বোঝাতে চাইছেন তার ওপর নির্ভর করে লিখন-প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়েছে। যখনই এই বোঝাপড়ার প্রসঙ্গ এল তখনই 'আধ্যাত্মিক অভিকরণ' প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীম 'অসততা করেছেন' এই অভিযোগ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তাঁর উদ্দেশ্য তো রামকৃষ্ণদেবকে তাঁর 'আধ্যাত্মিক অভিকরণ' সহ প্রকাশ করা। যখনই ভাষায় প্রকাশ করবেন তখনই সেই ভাষিক-প্রকাশ বিচ্যুত-প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ এখানে কতগুলি পর্যায়ক্রম কাজ করছে। রামকৃষ্ণদেব ও তাঁর আধ্যাত্মিক অভিকরণ প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে শ্রীমর চিত্তগত উপলব্ধি, তৃতীয় স্তরে রয়েছে শ্রীমর ডায়েরি, চতুর্থ স্তরে রয়েছে শ্রীমর কথামৃত। চতুর্থ স্তরের মধ্যে আবার নানা উপস্তর থাকতে পারে। কথামৃতের পত্রিকায় প্রকাশিত রূপ ও গ্রন্থে প্রকাশিত রূপের মধ্যে পার্থক্য থাকা সম্ভব। আবার গ্রন্থরূপও সংস্করণ ভেদে বদলায়। এই স্তরভেদ খেয়াল রাখা চাই। আবার সেই অভিকরণকে শ্রীম ভাষায় ধরতে চাইছেন বলে ভাষা সবসময়ই অতিরিক্ত অর্থ ও বোধ শ্রীমর সাপেক্ষে যোগ করবে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে গ্রন্থ বা লিপিবদ্ধ সত্যের চাইতে উপলব্ধির সত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হত বেশি। নিবেদিতা তাঁর 'The Oriental Experience' নিবন্ধে লিখেছিলেন, "Truth is not something that is told of in books or stated in words. It is the self-evident, the ultimate. It is that of which all our modes of seeing and saying are but so many re-

fractions through a falsifying medium.'' বিবেকানন্দ-সহোদর মহেন্দ্রনাথ যখন ঠাকুরের কথা লেখেন তখন সেজন্যই জানান, ওপরের থাক থেকে নেমে এসে ঠাকুর যেন কথা বলছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেন নুনের পুতুলের কথা। সাগরের জল মাপতে গিয়ে নুনের পুতুল গলে জল হয়ে গেল, ফিরে এসে তার পক্ষে আর সাগরের খবর দেওয়া সম্ভব নয়। ফিরে এসে খবর দিতে গেলে তাতে পুরো খবর কিন্তু মেলে না! অর্থাৎ কথার-জগৎ বা প্রকাশের-জগৎ তাই সর্বদাই উপলব্ধির জগতের এক থাক নিচে বর্তমান। নিবেদিতার ভাষা সম্প্রসারিত করে বলা চলে পরম সত্যের যেকোনও প্রকাশই তাই আদতে বিচ্যুতি সৃষ্টিকারী, ভ্রমাত্মক-মাধ্যম নির্গত পাঠ্য (text)।

শ্রীমর কথামৃত ভক্ত-পরিমণ্ডলে আদৃত। ঠাকুরের সহধর্মিণী মা সারদা ১৯০৪ সালে শ্রীমর কথামৃত শুনে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। পাঠ শোনার পর মা সারদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শ্রীম কেমন করে সব মনে রেখেছেন! মনে রাখার জন্য তাঁকে 'হাড়ভাঙ্গা' আশীর্বাদও করেছিলেন।[৩] গ্রন্থের ভাষিক-প্রকাশ তাঁর বোঝাপড়া বলেই তা নৈর্ব্যক্তিক নয়, সেই বোঝাপড়া গৃহী-ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত বা সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বোঝাপড়ার থেকে আলাদা। একথা ঠিকই, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' আর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' যে-প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা পেয়েছে, সে-মান্যতা গুরুদাস বর্মনের (প্রিয়নাথ সিংহ) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত' কিংবা সত্যচরণ মিত্রের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস : জীবনী ও উপদেশ' বইগুলি পায়নি। কোনও রচনা কীভাবে কেন জনপ্রিয়তা লাভ করে তা অবশ্য পৃথক আলোচনার বিষয়। কারণগুলি বহুক্ষেত্রেই পার্থিব, তবে একথা স্বীকার করতেই হয় প্রতিটি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীই আসলে রচয়িতার মনে প্রতিবিম্বিত শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রকাশ করেছে। রামকৃষ্ণ কেমন ছিলেন তার থেকেও এখানে গুরুত্বপূর্ণ রামকৃষ্ণকে তাঁরা কীভাবে বুঝেছেন বা বুঝতে চেয়েছেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন উৎস থেকে বিষয়জ্ঞান আহরণ করেছেন। একের সঙ্গে অপরের দেখার মিল না-ই থাকতে পারে। একে অপরের দেখাকে মেনে নাও নিতে পারেন। আবার একভাবে লেখার পরিকল্পনা করে অন্যভাবেও লিখে ফেলতে পারেন তাঁর ভাষ্য। কাদের জন্য লিখছেন এই ভাবনাও তাঁদের 'নির্মাণ'কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এমনকী প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা-পাওয়া দুটি বইয়ের অভিমুখও হতে পারে ভিন্ন। অবশ্য বলাই যায় প্রতিষ্ঠান তার তাগিদেই বিভিন্ন অভিমুখকে স্পর্শ করতে চায়। স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ' আর অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' কেবল লিখন- পদ্ধতিতেই আলাদা নয়, রচনার উদ্দেশ্যেও আলাদা।

শ্রীম রচিত কথামৃতের খণ্ডগুলি ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণীত 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থের খণ্ডগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লে শ্রীমর রচনারীতির প্রকার কী ছিল তা বুঝতে পারা যায়। তাঁর গ্রন্থ শুধু ঠাকুরের কথার অনুলিপি নয়, তা রামকৃষ্ণকথার ভাষ্য। তবে একথাও মনে রাখতে হবে শ্রীমর কথামৃতে ঠাকুরের উক্তি মোটের উপর যথাযথভাবেই সংকলিত হয়েছিল। মা সারদা শ্রীমর গ্রন্থ শুনতেন, শুনে খুশি হতেন। ঠাকুরের কথাই শ্রীমর বইতে শুনছেন এই অনুভূতি তাঁর হত। শ্রীম বলেছিলেন, ''তাঁর [রামকৃষ্ণদেবের] এক-একটি কথা এক-একটি মন্ত্র। সংস্কৃতে হলেই বুঝি মন্ত্র—বাংলায় হয় না? বেদ বেদান্ত সব আছে ওতে। কে শোনে? থাকুক তো তাঁর একটি কথা নিয়ে কেউ? তিনি বলতেন, 'তাঁকে ডাকতে হয় বনে, মনে আর কোণে।' এই কথাটি নিয়ে থাকুক দেখি কেউ?''[৪]

'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'বাইবেল' খুব মন দিয়ে

পড়েছিলেন তিনি। কথামৃত রচনার সময় চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কাঠামো তিনি স্মরণে রেখেছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রাগাধুনিক পর্বে রচিত চৈতন্যজীবনী প্রধানত চারটি। বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চারজনের রচিত জীবনীতে চৈতন্য-অনুভব চাররকম। এই চার জীবনীকারের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্রানুভবের সঙ্গে চৈতন্যজীবনের ঘটনাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, অন্যরাও যে শাস্ত্রের সঙ্গে চৈতন্যজীবনকে মেলানোর চেষ্টা একেবারে করেননি একথা বলা যাবে না। তবে তত্ত্বনিষ্ঠতা কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যেই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। তাঁর গ্রন্থে পয়ার-পঙ্‌ক্তির সঙ্গে প্রয়োজনমতো অজস্র শাস্ত্রবাক্য রয়েছে। শ্রীমর উপরের উক্তিটি খেয়াল করলে দেখা যাবে তিনি জানিয়েছেন, ''বেদ-বেদান্ত সব আছে ওতে।'' সুতরাং রামকৃষ্ণদেবের কথার সূত্রে নানা শাস্ত্রোক্তি উদ্ধার করে ভাষ্য রচনা করেন তিনি। কথার মধ্যে কীভাবে শাস্ত্রবোধ মিশে আছে তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন শ্রীম।

কথামৃতের প্রথম ভাগে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে ঠাকুরের ভক্তিযোগ নিয়ে কথা হচ্ছে, প্রথম ভাগের সেই সপ্তম পরিচ্ছেদের গোড়ায় গীতার শ্লোক উদ্ধার করেন শ্রীম—''ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম-ব্যক্তাসক্তচেতসাম্।/ অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥'' তারপর বাংলায় লেখেন, ''ভক্তিযোগ যুগধর্ম—জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।'' কথামৃতের পাঠক পরিচ্ছেদশিরের এই শ্লোক ও মন্তব্য পড়ে মন-প্রস্তুত করে তবে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথন পড়বেন। ঠাকুরের কথা শাস্ত্রবাক্যতুল্য সে-বোধ হবে তাঁদের। ঠাকুরের সঙ্গে গিরিশের কথা হচ্ছে। ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? উপরে শ্রীম ইংরেজিতে লেখেন, Perception of the Infinite, তলায় ইংরেজি ফুটনোট—''Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Muller's Hibbert Lectures and Gifford Lectures.'' ঠাকুরের কথা নিয়ে তুলনামূলক দর্শনতত্ত্ব আলোচনা করা চলে। কখনও কখনও কথামৃতের মধ্যে শ্রীম নিজের আবেগদীপ্ত ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ঢুকিয়ে দেন। ত্রয়োদশ খণ্ডে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গের কথা লিখতে গিয়ে শ্রীম লেখেন,

''সত্য সত্যই 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'— উদ্যানের ধূলি পর্যন্ত মধুময়!—ইচ্ছা হয়, গোপনে বা ভক্তসঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই। ইচ্ছা হয়, উদ্যানের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন এই মনোহারী গঙ্গাবারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের তরু লতা গুল্ম ও পত্রপুষ্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দান করি। এই ধূলির উপর দিয়া কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করেন!''

এই উচ্চারণে আমিহারা ভক্তের আকুতি প্রকাশিত হচ্ছে। গঙ্গাতীরবর্তী দক্ষিণেশ্বর তার ভৌগোলিক বাস্তবতা অতিক্রম করে যেন স্বর্গীয় তীর্থক্ষেত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। রানি রাসমণি মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে তাঁর অর্থকৌলীন্যকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় কৌলীন্যে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। তা হয়েছিল, ঠাকুরের সূত্রে শ্রীম স্থানটিকে আরও উচ্চতর মর্যাদা দিলেন। শহর কলকাতা 'কমলালয়', প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিকতার গর্ভগৃহ। তবে সে-কলকাতাও শ্রীমর কাছে তীর্থক্ষেত্র নয়। বৈষ্ণবরা নিত্যবৃন্দাবনের কল্পনা করেন—সে-বৃন্দাবন ভৌগোলিক বৃন্দাবন নয়, ভক্তচিত্তে সেই বৃন্দাবন নিত্য বিরাজমান। শ্রীম এখানে দক্ষিণেশ্বরকে সেই নিত্যতা প্রদান করলেন। সুতরাং কে বলে শ্রীমর 'কথা' কেবল ঠাকুরের কথার অনুলিপি? ভক্তহৃদয়ের কারুকার্য বাদ

যাওয়ার নয়। যায়নি। ভক্তহৃদয়ের সেই নিবেদন আমরা নানাজন নানাভাবে পাঠ করি।

'শ্রীম-দর্শন' থেকে নেওয়া এই উদ্ধৃতিতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আছে। শ্রীমর জিজ্ঞাসা, ''সংস্কৃত হলেই বুঝি মন্ত্র—বাংলায় হয় না?'' বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। মনে রাখতে হবে উনিশ শতকে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা গদ্যরচনার মাধ্যমে স্বপ্রতিষ্ঠ হচ্ছিল। প্রাগাধুনিক বাংলা ভাষার জগৎ আর উনিশ শতকের আধুনিক পাশ্চাত্য-প্রভাবপুষ্ট বাংলা গদ্যভাষার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। কলকাতার ভদ্রলোকেরা এই গদ্যরচনার মাধ্যমে আধুনিক বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের মুখের ভাষা কিন্তু কলকাতার ভদ্রলোকদের প্রমিত গদ্যভাষা নয়। অথচ সেই ভাষা শ্রীমর মতে মন্ত্রতুল্য। এ যেন আর এক বাংলা ভাষার জয়গাথা রচনা করছেন তিনি। যে-বাংলা ভাষা প্রাগাধুনিক সাহিত্যের বাহক, যে-বাংলা ভাষা কলকাতার বাইরের পল্লীগ্রামে জীবিত, সেই ভাষা রামকৃষ্ণদেবের মুখে ভর করে কলকাতার ভদ্রলোকের কাছে মন্ত্রবৎ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এ বড় কম কথা নয়। প্রাগাধুনিক ধর্ম-সংস্কৃতির ভাবধারা তো সমূলে বিনষ্ট হয়নি। রামকৃষ্ণদেব যে-পল্লী থেকে কলকাতায় এসেছিলেন গ্রামবাংলার সেই পল্লীর যাত্রা-পাঁচালি-কথকতায় প্রাগাধুনিক বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি-আচার বেঁচে ছিল। বালক গদাধর সেসব শুনতেন—তাঁর গ্রামজীবনের স্মৃতি-শ্রুতি-সংস্কৃতি তাঁর ভাষাশৈলীকে নির্মাণ করেছিল। সেই ভাষার থাকে গভীর ভাব যখন তিনি পরিবেশন করতেন তখন পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট কলকাতার আধুনিক ভাব-ভাষার থেকে তা পৃথক হয়ে যেত।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাঘ ১২৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল অস্বাক্ষরিত রচনা 'বাঙ্গলার পাঠক পড়ান ব্রত'। সে-রচনায় মুদ্রণ-সংস্কৃতিপূর্ব প্রাগাধুনিক বঙ্গদেশের সঙ্গে মুদ্রণ-সংস্কৃতিপুষ্ট আধুনিক বঙ্গদেশের তুলনা করা হয়েছিল। ''কয়েকজন কথকের দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গলা প্রস্তুত হইয়াছিল, প্রস্তুত ভাল হয় নাই সত্য কিন্তু তাঁহারা করিয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন বাঙ্গলা সম্পাদকগণদ্বারা প্রস্তুত হইবে।'' এই যে দুই কালের দুই বাংলা—একটিতে কথকতা মুখ্য, অন্যটিতে মুদ্রিত-গদ্য মুখ্য, একটি খারাপ অপরটিকে হতে হবে ভাল—সেই বিভাজনকেই যেন শ্রীম-রচনা-বাহিত রামকৃষ্ণকথা প্রশ্ন করছে। রামকৃষ্ণদেব প্রাগাধুনিক কথকতার ধারাকেই শুধু নতুন কলকাতায় আনছেন না, উপলব্ধির গভীরতায় কথার অনবদ্য এক সংস্কৃতি নির্মাণ করছেন। সেই অনবদ্য বাক্-সংস্কৃতি আধুনিকের প্রতিস্পর্ধী। সেই পৃথক অনবদ্যকে শ্রীম ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। আবার 'শ্রীম-দর্শন' থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধার করা যাক।

''একটি বেশ ছড়া বলতেন, 'মন্দিরে তোর নাইকো মাধব, শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল।' কলকাতায় তখন খুব লেকচার হত কিনা, তাই ঐ গল্পটি বলতেন। শুধু লেকচারে কাজ হয় না। 'মাধব' প্রতিষ্ঠা করা চাই, অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন। ঠাকুরের কাছে যাবার আগে ব্রাহ্মসমাজে যেতাম। সেখানে খুব লেকচার হতো। ঐ সব শুনে মনে হতো ঈশ্বর অনেক দূরে! আনন্দ হতো না। ও মা, ওঁর কাছে গিয়ে দেখি কথা কন ঈশ্বরের সঙ্গে। যেন ঘরের লোক।''[৫]

রামকৃষ্ণদেব যে ঘরের লোকের মতো কথা বলতেন, সেকথা উপমাধর্মী, বিবরণমূলক। উপমা আর বিবরণের মাধ্যমে ভাবের সত্যে ঠাকুর উপনীত হচ্ছেন। তার কাছে কোথায় লাগে কলকাতার লেকচার! উপমা-বিবরণ প্রাত্যহিক জীবন থেকে উঠে আসে—তাতে গ্রামজীবনের ছবি যেমন আছে

তেমন আছে শহরের কথাও। শ্রীমর ভাষ্য ও বিস্তার সরিয়ে রেখে বেশ কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা যাক। ইচ্ছে করেই 'শ্রীম-দর্শন' থেকে ঠাকুরের কথাগুলি নির্বাচন করা হল। 'শ্রীম-দর্শন'-এ শ্রীম কথক, লেখক নন। লেখার সময় বা লেখার জন্য বলার সময় আমরা সচেতনভাবে অনেককিছু বাদ দিয়ে থাকি। শ্রীম কথামৃত রচনা করার সময় সচেতনভাবেই হয়তো কলকাতার ভদ্রলোকদের রুচির কথা ভেবে অনেক কিছু বাদ দিয়েছেন, 'শ্রীম-দর্শন'-এ সে বালাই কম। সেখানে শ্রীম বলছেন, তাছাড়া তখন কথামৃতকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 'শ্রীম-দর্শন' থেকে ঠাকুরের বাক্য কয়েকটি সাজিয়ে দেওয়া যাক। এই বাক্যগুলি অবশ্য কথামৃততেও পাওয়া যাবে তবে সেখানে প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গের সূত্রে অনেক সময় কথাগুলি থেকে একটু চোখ সরে যায়। এখানে সেসব বাদ দিয়ে একেবারে সরাসরি কথাগুলি তুলে ধরা হল।

''মনই সব—যেন ধোপাঘরের কাপড়, যে রং-এ ছোপাবে সেই রং ধরবে।''

''হেগো গুরুর পেদো শিষ্য।''

''যে নুনের হিসাব করতে পারে সে চিনির হিসাবও করতে পারে।''

''শাক ভাত দুটি মুখে দিয়ে সারাদিন ভগবানের নাম কর। পাঁচটা রান্না—মাছ, মাংস, নিরামিষ—অতোর কি দরকার?''

''ওকি করছো, অতোর দরকার কি? শেয়াল না ঢোকে এমনতর করে দাও।'

''বান এলে ড্যাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল।''

''মা আমায় দেখিয়ে দিলেন ওসব বেশ্যার গু। দেখালেন ধামা পোঁদ বেশ্যারা পড়্‌পড়্‌ করে হাগছে। তখন হৃদয়কে বকতে আরম্ভ করলুম, কেন আমাকে শক্তি চাইতে শিখিয়েছিলে?''

এই বাক্যগুলিতে যে-ভাষা তা কলকাতার ভদ্র-শিষ্ট ভাষা নয়। হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ-ভাষার অভিঘাত গভীর। ঠাকুরের এই বাক্যগুলি থেকে তাঁর ভাষাভঙ্গি বিষয়ে কতগুলি কথা বলা সম্ভব। অলংকারশাস্ত্রে যে-অর্থালংকারগুলিকে আমরা সাদৃশ্যমূলক অলংকার বলি তা ঠাকুরের কথায় উঠে আসত। সাদৃশ্যমূলক অলংকার অভিজ্ঞতালব্ধ। একটি বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর বা একটি বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের মিল অভিজ্ঞতা ছাড়া দেখানো অসম্ভব। কখনও কখনও তাঁর বাক্য ব্যঞ্জনাগর্ভ। সে-বাক্যে কোনও অলংকারের বাহুল্য নেই, যা বলতে চাইছেন সেই বিষয়টি রসিক শ্রোতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। বাক্যে যা বলা হয়েছে তা কেবল বাক্যটির সাধারণ অর্থ ভেদ করলে বোঝা যাবে না, সাধারণ অর্থটিকে ধরেই বলতে চাওয়া অন্য অর্থে উপনীত হওয়া চাই, রসিকজনের পক্ষেই তা সম্ভব। ধরা যাক 'বান এলে ড্যাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল'—এই বাক্যটি। এখানে একটি সাধারণ গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার ছবি আছে। বন্যা এলে শুকনো ডাঙাতেও এক বাঁশ উঁচু জল জমে যেতে পারে। ঠাকুর এই ছবিটিই শুধু প্রকাশ করতে চাইছেন না; ভক্তির বন্যা এলে শুকনো হৃদয়ও ভেসে যেতে পারে, একথা বলতে চাইছেন। রসিক ভক্ত তা বুঝতে পারছেন। এই যে কিছু উপমা যা দিয়ে গভীর কথা বলা—এ খুব উঁচুদরের ভাষাশিল্পীর কাজ। ঠাকুর তা পেরেছিলেন। তাঁর কথায় আবার কখনও কখনও নির্দেশও থাকত। সেই নির্দেশ রূঢ়ভাবে দিতেন না। কোনও সাংসারিক উপমার মাধ্যমে দিতেন। যেমন রান্নার কথা, শেয়াল আটকানোর কথা। সংসারজীবনে বা সন্ন্যাসজীবনে বাহুল্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। শাক-ভাত হলেই হল, শেয়াল আটকানো যায় এমন ঘর হলেই হল—আহারের বাহুল্যে বা ঘরের কারুকার্যে মন গেলে তো সেখানেই সবটুকু মন লেগে যেতে পারে, তখন সে-মন বস্তুপ্রপঞ্চের বাইরে যেতে চাইবে না।

তাঁর কথার সবচেয়ে সমস্যাজনক অংশ হল ভদ্রলোকদের মানদণ্ডে যাকে বলে অশ্লীল বাক্য। ঠাকুরের যে-বাক্যগুলি উপরে উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে দ্বিতীয় ও শেষ বাণীদুটি কলকাতার ভদ্রলোকদের রুচিতে অশ্লীল বলে বোধ হতে পারে। সেকালের বাঙালি রুচি নির্ধারক লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে কলকাতার ও বঙ্গদেশের লেখকদের জন্য শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে নিদান দিয়েছিলেন। নিদানটি এইরকম, ''বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যা ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।'' (নিম্নরেখা সংযোজিত) বঙ্কিমের এই মতামত এমনিতে খুবই উদার। তবে অশ্লীল শব্দকে বঙ্কিম ছাড় দেননি। এখানে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। শব্দ তো আলাদা করে শ্লীল বা অশ্লীল হয় না—শব্দপ্রয়োগের উদ্দেশ্য-বিধেয়র উপর তার শ্লীলতা-অশ্লীলতা নির্ভর করে। রামকৃষ্ণদেবের উদ্ধৃত উপদেশের দ্বিতীয় ও শেষ বাণীটি ঠাকুরের মনের বিকৃতি ও ক্রোধের প্রকাশক। যেমন গুরু তেমন শিষ্য বোঝাতে তিনি দ্বিতীয় বাক্যটি প্রয়োগ করেছেন। সেকালের কলকাতায় ও বঙ্গদেশে অযোগ্য গুরু-শিষ্যের অভাব ছিল না। গুরুর লোভ, আসক্তি ষোলো আনা। অথচ গুরু হওয়ার সাধ। কলকাতা আর তার আশেপাশে এইসব লোভী আসক্ত গুরু-শিষ্যের নানা কেচ্ছা তখন শোনা যেত।

ঠাকুরের শেষ উদ্ধৃত বাণীটি আলাদাভাবে বিচারযোগ্য।

অলৌকিক শক্তি—যাকে সিদ্ধাই বলা হয়—সে-বিষয়ে ঠাকুরের খুবই বিরক্তি। সেই বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কথাগুলি বলেছিলেন। শ্রোতার মনে তা একরকম ঘেন্না জাগিয়ে তোলে। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে অঙ্গী রসের তালিকায় বীভৎস রস ঠাঁই পেয়েছে। স্থায়িভাব জুগুপ্সা থেকে বীভৎস রসের উৎপত্তি। জুগুপ্সা শব্দের চলিত অর্থ ঘৃণা বা ঘেন্না। রসশাস্ত্রীরা জানিয়েছেন 'অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দদোষ' বীভৎস রসের উৎপত্তি ঘটায়। এখানে শক্তি বা সিদ্ধাই—যাকে বলা যায় সাধনলব্ধ অলৌকিক সামর্থ্য—তার প্রতি ঘেন্না জাগানোই ঠাকুরের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই আপাত অশ্লীল দৃশ্যের অবতারণা। অপ্রিয় বস্তুর দর্শন (ধামা পোঁদ), শব্দদোষ (পড়্‌পড়্‌ করে) জুগুপ্সা সঞ্চারক। সুতরাং ঠাকুরের বাণীতে যে-শব্দগুলি আপাত অশ্লীল সেগুলির প্রয়োগের কারণ খেয়াল রাখলে তা আর অশ্লীল বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত বলা যায় বুদ্ধদেবও সিদ্ধাই-বিরোধী ছিলেন।

একটি টিপ্পনী। সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উদ্দেশ্যে অপশব্দের প্রয়োগ চোখে পড়ে। নবারুণ ভট্টাচার্যের 'কাঙাল মালসাট' খুবই গুরুত্বপূর্ণ রচনা, চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। সেখানে কলকাতার মধ্যে থাকা প্রান্তিক মানুষদের প্রতিবাদের ভাষায় নানা অপশব্দের সমাহার। চলচ্চিত্রের রূপটি দেখার সময় শারীরিক ও শরীর সম্বন্ধীয় অপশব্দ শুনে ভুবনগ্রাম কলকাতার ভদ্র বাবু-বিবিরা উপভোগ্যতার সুখে হাস্যময় হয়ে ওঠেন। যেন ওই 'অপশব্দ' প্রয়োগে ও শ্রবণে প্রান্তিক মানুষদের বিপ্লব সমাপ্ত হল। 'অপশব্দ' প্রয়োগের এই সাম্প্রতিক রীতির সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত অপশব্দের বয়নকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। বস্তুত এইগুলি যে 'অপশব্দ' এই সচেতনতাই ঠাকুরের নেই। তিনি তীব্র ক্রোধে ও বিরক্তিতে ঘৃণা-বিবমিষা জাগানোর জন্যই এমন বাক্য প্রয়োগ করছেন এবং শ্রোতার চিত্তে বিবমিষা জাগছে। অথচ নবারুণের উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপান্তরে অপশব্দগুলি দর্শকদের মনে প্রান্তিক মানুষদের জন্য কোনও

সমমর্মিতা তৈরি করে না। বাবু-বিবিরা নিজেরা এমন অপশব্দ বলেন না বলে এক্ষেত্রে পরোক্ষে অপশব্দ বলার আনন্দ—যাকে ইংরেজিতে বলে 'vicarious pleasure'—তা লাভ করেন। নবারুণের আগে বামপন্থী উৎপল দত্ত তাঁর 'টিনের তলোয়ার' নাটকে 'কলকাতার তলায়' থাকা মানুষদের কথা ও তাদের ভিন্ন রুচির ভাষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের ভাষিক-ভিন্নতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন উৎপল দত্ত তাঁর 'গিরিশ মানস' বইতে। নবারুণের উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়িত রূপ দেখে যেমন কলকাতার নব্য-বাবু-বিবিরা অপশব্দ শ্রবণে হাসেন ও বাঁকাপথে সেই শব্দ উপভোগ করেন, তেমনি রামকৃষ্ণদেবের কথার কদর্থ হতে পারে এই শঙ্কা করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান' বইতে লিখেছিলেন,

''কেহ যদি গোঁড়ামি করিত বা সংকীর্ণভাবে কথা বলিত, তাহা হইলে তিনি নিজের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় একটি উপাখ্যান তুলিয়া উত্তর দিতেন। অনেক সময় উত্তর দেওয়ার ভাষা কলিকাতার সমাজের রুচিবিগর্হিত হইত বটে, কিন্তু উত্তরের উদ্দেশ্য হইত অতি সুন্দর এবং তাৎপর্য হইত অতীব নিগূঢ়; সাধারণ লোকে উহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া শক্তির অপব্যয় করিবে এবং কি উদ্দেশ্যে পরমহংস মশাই এরূপ কড়াভাবের হাসি-তামাশা করিতেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উহার কদর্থ করিবে এইজন্য ইচ্ছাপূর্বক এ সম্বন্ধে সে সকল কথা পরিত্যাগ করিলাম।"[৬]

গ্রাম থেকে শহর কলকাতায় যাঁরা চলে এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই কলকাতার মান্য ভাষায় কথা বলতেন না। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথন থেকে জানা যাচ্ছে বিদ্যাসাগরের মুখের ভাষা কলকাতার মান্য ভদ্রভাষাকে অনেক সময় অতিক্রম করে যেত। আশুতোষ মিত্র তাঁর স্মৃতিকথা 'শ্রীমা'-তে জানিয়েছেন মা-সারদা দুরকম চালে কথা বলতেন। গ্রামের ভাষা, কখনও কলকাতার ভাষারূপ, যখন যেমন। ঠাকুর ভাষাশিল্পী বলেই তাঁর মুখের ভাষাটিকে ভাবব্যঞ্জক করে তুলতে পেরেছিলেন। কলকাতার ভদ্র-বাবুদের নিক্তিতে সে-ভাষা বহিরঙ্গে অনেকক্ষেত্রে গ্রাম্য, অশ্লীল কিন্তু অন্তরঙ্গে অধ্যাত্ম-অনুভূতির ব্যঞ্জনাবাহী।

এখানে একটি প্রশ্ন তোলাই যায়। শ্রীম কেন ঠাকুরের কথাগুলিই শুধু রেখে দিলেন না? ভাষ্য-যোজনা করার খুব প্রয়োজন ছিল কি? অনেক পরে রামকৃষ্ণ-প্রাণিত লেখক কমলকুমার মজুমদারের স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদার বিপরীত কাজটি করেছিলেন। ভাষ্য ও বাহুল্যের খোসা ছাড়িয়ে ঠাকুরের মূল কথার অভিমুখে ফিরতে চাইছিলেন তিনি। দয়াময়ী মজুমদারের কয়েকটি বইয়ের কথা মনে পড়বে। 'জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ' (১৯৮৪), 'অমৃতকথা' (১৯৮৮), 'মহাজীবন কথা/ শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ' (১৯৯৯)। শ্রীম উনিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাঁর ভালবাসার ঠাকুরকে ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিতে চান বলেই ঠাকুরের কথার ওপর নানা ভাষ্য-যোজনা করেন। পাছে ভদ্রলোকেরা ঠাকুরের অন্যরকম কথা ধরতে ব্যর্থ হন, তাই এই ভাষ্যের খোলস। মনে রাখতে হবে রামকৃষ্ণের শিক্ষিত ভদ্রলোক শিষ্যরা তাঁদের সমকালে 'আধুনিক', পাশ্চাত্যের হাতফেরতা 'আধুনিক'-এর যোগ্য সমালোচক হয়ে উঠতে পারেননি। তাই তাঁদের দায়িত্ব ছিল ঠাকুরকে শাস্ত্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার। শ্রীম সে-দায়িত্ব পালনের জন্যই ভাষ্য-যোজনা করেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও বাইবেল উনিশ শতকীয় আধুনিকের অংশ হয়ে উঠেছিল। ওরিয়েনটালিস্ট বা প্রাচ্যবাদী সাহেবরা সংস্কৃত শাস্ত্রকে মান্য-গণ্য করতেন। সে-মান্যতা বাংলা ভাষার ছিল না। শ্রীম তাই সংস্কৃত শাস্ত্রে ও বাইবেলের বাণীতে ঠাকুরকে মিলিয়ে নেন। অন্যদিকে ফরাসি ভাষাবিশেষজ্ঞ কমলকুমার

মজুমদার সাহেবদের হাতফেরতা আধুনিকের সমালোচক। তাই রামকৃষ্ণদেবকে টীকা-ভাষ্য ছাড়াই তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। রামকৃষ্ণদেবের নিজ ভাষাই তাঁর কাছে পরম। কমলকুমার লেখেন,

''আমরা যে বিরাট ভক্তির ঐতিহ্যের ধারক, যে দেশে মহাপ্রভু আসিয়াছেন, যেখানে ভগবান রামকৃষ্ণ ছিলেন, আমরা সেই দেশেরই, বালিশে লুকানো মাথা ঈষৎ উন্নত করিয়া আঁখিপদ্ম মেলিতে পারিলাম, ইহা সুনিশ্চিত যে বহুজন্মের সুকৃতির কারণে আমরা বাঙলাদেশে জন্মিয়াছি—আর তাঁহারা বাঙলায় কথা কহিয়াছেন।''[৭]

তাই শ্রীমর অভিমুখ আর দয়াময়ী-কমলকুমারের অভিমুখ ভিন্ন। শ্রীম যত্ন করে ভাষ্য-যোজনা করেন। দয়াময়ী-কমলকুমার ভাষ্য অতিক্রম করে ঠাকুরের কথায় পৌঁছতে চান। দো-আঁশলা আধুনিকতার চাইতে তাঁদের কাছে বঙ্গজ-প্রাগাধুনিকতার স্রোতোধারা অনেক বেশি মর্মস্পর্শী ও মাননীয়। গদ্যে রচিত কমলকুমারের রামকৃষ্ণ-প্রার্থনাটি মনে পড়ে। ''ঠাকুর আমার ব্যাকুলতায় আমার দৃষ্টির ঘ্রাণশক্তি হউক, আমি পদ্মগন্ধ লভিব।/ ঠাকুর আমার ডাকে আমার দৃষ্টির শ্রবণশক্তি হউক, আমি বাঁশরীধ্বনি শুনিব, নূপুরধ্বনিতে হাত বুলাইব।/ ঠাকুর আমার তোমার জন্য অস্থিরতায়, আমার দৃষ্টির স্পর্শক্ষমতা হউক, আমি পদদ্বয় ছুঁইব।''[৮] এই প্রার্থনাটিতে ইন্দ্রিয়-বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে, ইন্দ্রিয়ের যুক্তি ভেঙে পড়েছে। 'আধুনিক' যুক্তিনিষ্ঠ কলকাতা মানব-ইন্দ্রিয়ের প্রচলিত প্রয়োগে রামকৃষ্ণকে জানতে বুঝতে গিয়ে ব্যর্থ। কমলকুমার জানেন, ইন্দ্রিয়ের যুক্তিবোধ দিয়ে রামকৃষ্ণকে বোঝা যায় না—তাই ইন্দ্রিয়-সংস্থানকে তিনি বিপর্যস্ত করে দেন। উনিশ শতকের কলকাতার আধুনিক গদ্যভাষাকে বিপর্যস্ত করেই রামকৃষ্ণ তাঁর কথা সাজান, শ্রীম তা খানিক ধরেন, তবে ভাষ্য-যোজনা করে যেন আধুনিক শ্রোতা-পাঠকদের মনোমতো করে তুলতে চান। কমলকুমারের সে-দায় নেই।

এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিত। যথার্থ সাধক ও ভক্ত ব্যাখ্যা-বাহুল্যকে বিচার-তর্ককে সঙ্গে নিতে চান না। এক-একটা ছোট বাক্যের গভীর অনুভব বুঝতে ও পালন করতেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয়। প্রাগাধুনিক বৈষ্ণব-সংস্কারে পাঠাধিক্য বাড়বানলের সঙ্গে তুলনীয়। ঠাকুরও শুকনো তর্ক-পাণ্ডিত্য এসবের বিরোধী ছিলেন। তবে শ্রীমর ভাষ্য শুষ্ক পাণ্ডিত্য ছিল না। ঠাকুর তাঁর কাছের ভক্তদের পাণ্ডিত্যের গরিমা দেখে হাসতেন, মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে নিজের পড়াশোনা না জানাকে প্রকাশ করে কৌতুক বোধ করতেন। তাঁর মনে এজন্য কোনও হীনতার বোধ ছিল না। পুনশ্চ মহেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষ্য :

''পরমহংস মশাই কখনো কখনো আনন্দ করিয়া এই রকম তর্ক-বিতর্কের সময় কথাবার্তা কহিতে যাইতেন। নরেন্দ্রনাথ ছিল রুদ্রমূর্তি, তাহার কাছে খাতির আবদার বড় চলিত না। সে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিমাণ বুঝিত। তখন অনেক সময় নরেন্দ্রনাথ মুখঝামটা দিয়া পরমহংস মশাইকে বলিত, 'তুমি দর্শনশাস্ত্রের কী জান? তুমি তো একটা মুক্‌খু লোক।' পরমহংস মশাই আনন্দিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'লরেন আমাকে যত মুক্‌খু বলে, আমি তত মুক্‌খু লই!' তিনি নিজের বাঁ-হাতের চেটোতে ডান হাতের আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিতেন, 'আমি অক্ষর জানি।' ''[৯] (নিম্নরেখা সংযোজিত)

আধুনিকের বিপরীতে উপলব্ধির প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়ে যেভাবে হাসিমুখে ঠাকুর দাঁড়াতে পারতেন সেই প্রজ্ঞা ও প্রত্যয় তাঁর শিষ্যদের ছিল না বলেই পাছে লোকে ভুল বোঝে বলে তাঁরা তাঁদের আদরের ঠাকুরকে নানা ভাষ্যে আধুনিকের উপযুক্ত করে তুলতে চাইতেন। পাশ্চাত্য আধুনিকের সঙ্গে

বোঝাপড়ায় উনিশ শতকে ভারতের সুবর্ণ অতীত কল্পনার ধারা গড়ে উঠেছিল, পাশ্চাত্যের জড়বাদের বিপরীতে ভারতীয় চৈতন্যবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' বইয়ের প্রথমেই ঠাকুরকে এই অক্ষে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'র উদ্দেশ্য আবার আলাদা। প্রাগাধুনিক বঙ্গভূমের সংস্কৃতির সঙ্গে ঠাকুরের যোগ-সাধন তাঁর উদ্দেশ্য। লেখেন, ''শহরে চাকুরি করি পাড়াগাঁয়ে ঘর। অন্নকষ্ট হেতু চিরকাল দেশান্তর॥'' এই দেশান্তর থেকে যদি কখনও গ্রামে ফেরেন তাহলে কী করবেন? ঠাকুরের পুঁথি শোনাবেন। খালি পেটে অবশ্য নয়। ''হেনরূপে নিমন্ত্রিয়া যত গ্রামবাসী। রাখিতাম প্রভু-প্রিয় জিলিপির রাশি॥/ বসাইয়া সিংহাসনে ঠাকুর আমার।/ চন্দনে সাজায়ে দিতু গলে ফুলহার॥'' সত্যনারায়ণের যেমন সিন্নি, রামকৃষ্ণদেবের তেমন জিলিপি। অক্ষয়কুমার সেন একেবারে বৈষ্ণবতায় রামকৃষ্ণ-সাধনা করেন। ''নাহি চাই জপ তপ ধ্যান আচরণে।/সাযুজ্য সালোক্য আদি সামীপ্য নির্বাণে॥/ নাহি চাই সিদ্ধাই ঐশ্বর্য্যাদি যত।/ বিড়ম্বনা মাত্র বোধ নহে মনোমত॥/ সাজাইব মনোমত ঠাকুর আমার।/ অবিরত রব রত সেবাতে তাঁহার॥'' গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যেমন কেবল কৃষ্ণসেবা করেন তেমনই ঠাকুর-ভক্ত অক্ষয়কুমার চান পল্লীবাংলায় ঠাকুরের সেবাধর্ম প্রচলিত হোক। এর থেকে বোঝা যায় একদিকে যেমন ঠাকুরকে আধুনিকের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে, তেমনি ঠাকুরকে যে পল্লীবাংলার সাংস্কৃতিকতার অঙ্গ করে তুলতে হবে সে-ভাবনাও তাঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'-প্রণেতাকে বিবেকানন্দ আর্শীবাদ করেছিলেন, বাহবা দিয়েছিলেন।

ঠাকুর প্রাগাধুনিক পর্বের বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তির ধারাকে যে শুদ্ধরূপে নবায়িত করে নিয়েছেন সেকথাও অবশ্য শ্রীম জানতেন। এমনিতে শ্রীমর শ্রীচৈতন্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'মাষ্টার মশায়ের অনুধ্যান' বইতে শ্রীমর কথা লিখতে গিয়ে জানিয়েছিলেন,

''বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি, বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ ও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অনেক সময় তিনি শ্রীচৈতন্যের উপাখ্যান তুলিয়া অতি সুন্দরভাবে বুঝাইতেন। ভাবে তিনি এত বিভোর হইয়া যাইতেন, যে যেন মনে হইত তিনি বর্তমান সময় ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের সময়েতে নবদ্বীপ বা পুরী চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সমসাময়িক ও গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া সমস্ত দেখিতেছেন ও বলিতেছেন।''

এই বৈষ্ণবভাবাপন্ন হওয়ার ফলে শ্রীমর পক্ষে ঠাকুরকে বোঝা সহজ হয়েছিল। ঠাকুরের কথার পাশাপাশি ধর্মযাপনে গীত-কীর্তনের ভূমিকা ছিল। গীতের ক্ষেত্রে শাক্ত-বৈষ্ণব দুই ঐতিহ্যই অনুসৃত। কালী-সাধক ঠাকুরের রামপ্রসাদের গান বড় প্রিয় ছিল। তাঁর কীর্তনের বিবরণ শ্রীম ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত দুজনেই দিয়েছেন। মহেন্দ্রনাথের বিবরণ শ্রীমর বর্ণনার থেকেও মনোগ্রাহী।

প্রাগাধুনিক পর্বের বৈষ্ণব ভক্তি ও শাক্ত ভক্তির ধারা 'আধুনিক' কলকাতা শহরে তত সজীব না থাকলেও বঙ্গদেশের অন্যত্র সজীব ছিল। বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তির সঙ্গে তন্ত্রাচার মিশে যে-শরীরকেন্দ্রিক সাধনপন্থার ধারা গড়ে উঠেছিল তার প্রতি কলকাতার শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বিরক্তি ছিল অনিবার্য। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান' বইতে সেকথা লিখেছিলেন।

''শিমলা এবং কাঁসারীপাড়াতেও এইরূপ ভৈরবীচক্রের আড্ডা ছিল। আমরা ছেলেবেলায় এই সকল ভৈরবীচক্রের লোকদিগের চালের ধামা উলটাইয়া দিয়াছি এবং অনেক মারপিটও করিয়াছি।

আমরা নতুন কলিকাতার এক প্রকার প্রথম পর্যায়; এইজন্য, পুরানো হীন আচার-পদ্ধতিসমূহ এত ঘৃণা করিতাম ও ভৈরবীচক্রের লোকদিগকে মারপিট করিতাম। এইরূপ মার দেওয়াতে, ভৈরবীচক্রের দল প্রকাশ্যে কিছু কমিয়াছিল। বোষ্টমী নাম দিলে লোকে বিশেষ আপত্তি করিবে না, এইজন্য, পরে, এই ভৈরবীচক্রগুলি নাম পরিবর্তন করিয়া 'শচীমা-ভজা' দল বলিয়া আত্মপরিচয় দিত। এইসব আখড়াগুলিতে অতি বীভৎস কার্য হইত।" (নিম্নরেখা সংযোজিত)

শাক্ত ও বৈষ্ণবধারার এই সহজ-শরীর সম্বন্ধীয় অজাচারের ধারা 'নূতন কলিকাতার' অপছন্দ। শিষ্ট ব্রাহ্ম-সংস্কৃতি ভদ্রলোকের জন্য শীলিত বৌদ্ধিক ধর্মসাধনার ব্যবস্থা করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণদেব প্রাগাধুনিক ভক্তির মরমিয়া ধারাটিকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করলেন। কাজটি কঠিন—রামকৃষ্ণদেবকে তাঁর ভক্তরা চৈতন্যদেবের সঙ্গে তুলনা করতেন। প্রসাদী গানও ঠাকুরের কণ্ঠে গীত হত। বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তির এই পরিশুদ্ধ ধারাটি কলকাতার ভদ্রলোকদের ক্রমে আকৃষ্ট করল। শ্রীম তা খেয়াল করেছিলেন।

শ্রীমর 'কথা' তাই ঠাকুরের কথার বিচারে ও ভাষ্যে দুই অভিমুখে প্রসারিত। একদিকে সংস্কৃত শাস্ত্র, পাশ্চাত্য দর্শন, বাইবেল ইত্যাদির স্পর্শে ঠাকুর 'আধুনিক'দের কাছে গৃহীত হচ্ছেন। অন্যদিকে বৈষ্ণবীয় কীর্তনে প্রসাদী গানে কলকাতায় বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তির শুদ্ধধারাটি পুনর্নব হয়ে উঠছে। ঠাকুর নিজে অবশ্য এই আধুনিকের ধার ধারেন না। রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ছোট্ট উঠোনটিতে গিয়ে ঠাকুর কীর্তন করতেন। তাঁর কোঁচার কাপড়টি ফেটি করে কোমরে বাঁধতেন। জামাটি গায়ে থাকত। কখনও কাপড়টি কোঁচা দিয়ে রাখতেন, কখনও বা কোঁচাটি খুলে লম্বা চাদরের মতো কাঁধে ফেলতেন। আধুনিক সুশিক্ষিত যুবক নরেন্দ্রনাথ দূরে উত্তরদিকের দেওয়ালটির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন, দেখতেন।

তথ্যসূত্র

১। অমলেশ ত্রিপাঠী, *ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৯৯৯), পৃঃ ৩৭

২। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, *রামকৃষ্ণের ধর্ম*, অনুবাদ : সৌরীন্দ্রনারায়ণ সরকার (কমলিনী প্রকাশন বিভাগ : কলকাতা, ২০১৫), পৃঃ ৪৫

৩। দ্রঃ অভয়চন্দ্র ভট্টাচার্য, *শ্রীম'র জীবনদর্শন*, (গ্রন্থভারতী)

৪। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, *শ্রীম-দর্শন* (শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট : চন্ডীগড়) ভাগ ২, পৃঃ ১০-১১

৫। *তদেব*, পৃঃ ১৬৯-১৭০

৬। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান*, ধীরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা ২০১৪), পৃঃ ১৪০-১৪১

৭। কমলকুমার মজুমদার, 'কথা ইসারা বটে' ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (চর্চাপদ : কলকাতা, ২০০৯) পৃঃ ১৫৬ [এরপর, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*]

৮। কমলকুমার মজুমদার, সাক্ষাৎ ভগবৎ দর্শন, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, পৃঃ ৩৩৮

৯। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান*, পৃঃ ৭৫